প্রথম অধ্যায়

জনপ্রশাসন : প্রকৃতি, পরিধি ও বিবর্তন

ভূমিকা (Introduction) : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী হিসেবে সরকারের তিনটি বিভাগ—আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের—গঠন, কাজের প্রকৃতি ও রূপের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এই তিনটি বিভাগের অন্যতম শাসনবিভাগের কর্মকাণ্ডের দিকটি সাধারণভাবে প্রশাসন নামে পরিচিত। যেকোনো ধরনের শাসনব্যবস্থাতে—তা সে রাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক যাই হোক না কেন—সরকারের প্রশাসনিক দিকটি সর্বক্ষেত্রেই বর্তমান। শুধু তাই নয়, সরকারের প্রশাসনিক দিকটি জনগণের জীবনকে সবসময়েই কোনো না কোনো ভাবে ছুঁয়ে যায়। যেমন আমরা যখন সরকারী বাস বা ট্রেনে করে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছোই তখন আমরা পরোক্ষভাবে সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। অসুস্থ হয়ে যখন আমরা সরকারী হাসপাতালে যাই তখনও আমরা সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে একইভাবে জড়িয়ে পড়ি। বিশেষ করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্র তথা সরকার সামাজিক জীবনের এত বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যে জনপ্রশাসনকে উপলব্ধি করা, অনুভব করা বা তার সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়া খুবই সহজ।

কিন্তু জনপ্রশাসনকে অনুভব করা যেমন বিষয়টির একটি দিক, আর একটি দিক হল জনপ্রশাসনের আলোচনার দিক—অর্থাৎ একটি বৌদ্ধিক বিষয় হিসেবে জনপ্রশাসন।

একটি সরকারী কর্মকাণ্ড হিসেবে জনপ্রশাসন এবং বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে জনপ্রশাসন (Public Administration as a governmental activity and Public Administration as an intellectual exercise) :

আজকের যুগের মতো একটি স্বতন্ত্র বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে না থাকলেও শাসনবিভাগের কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রশাসন চিরকালই ছিল। সেই দিক থেকে বলা

যায় যে সরকারের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে শাসনবিভাগের প্রধান মাধ্যম হল জনপ্রশাসন। যেমন প্রত্যেকটি সামাজিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় তেমনই প্রশাসনিক ব্যবস্থাও সমাজে লক্ষণীয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন দুই মহাকাব্যে—রামায়ণ ও মহাভারতে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে—সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, তার গঠন, কাজ, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তাতেও প্রশাসনিক বিষয়ের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। অ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্স' গ্রন্থে প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় ও ধারণা আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং শাসনবিভাগের কাজ, কাজের প্রক্রিয়া হিসেবে জনপ্রশাসন একটি প্রাচীন বিষয়। কিন্তু একটি বিদ্যাচর্চার বিষয়বস্তু হিসেবে একই কথা প্রযোজ্য নয়—অর্থাৎ বিদ্যাচর্চার বিষয় হিসেবে জনপ্রশাসন নিতান্তই নবীন। অষ্টাদশ শতকে জার্মানীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই বিষয়টিতে সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হন। পশ্চিম ইউরোপে দু'ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে : ইঙ্গ-মার্কিন ও ফরাসী। প্রথম ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, সক্রিয় নাগরিক অংশগ্রহণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, দায়িত্বশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। অপরদিকে ফরাসী প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, জাতীয় আইনসভার প্রাধান্য, জনকৃত্যকের পেশাগত দক্ষতা ইত্যাদি। গণতান্ত্রিকীকরণ ও শিল্পায়নের ফলে এই দুই বিপরীতধর্মী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে কাছে আসতে থাকে। সরকারের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রশাসন অত্যন্ত জটিল ও বিশেষীকৃত হয়ে ওঠে। সরকারী কাজকর্ম ও সরকারী সংগঠনকে আরও দক্ষভাবে গড়ে তোলার জন্য সরকারী কর্মীদের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার হন মার্কিন গবেষক, প্রশাসক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা। এই প্রেক্ষাপটেই একটি বৌদ্ধিক বিষয় হিসেবে জনপ্রশাসন শাস্ত্রের জন্ম হয়।

১৮৮৭ সাল Political Science Quarterly পত্রিকায় উড্রো উইলসনের (Woodrow Willson) লেখা The Study of Administration শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই ঘটনাটিকে জনপ্রশাসনের জন্মলগ্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উইলসন ওই প্রবন্ধে মন্তব্য করেন যে, একটি সংবিধান রচনা করার চেয়ে সংবিধানকে কার্যকরী করা অনেক বেশী দুরূহ। সেই কারণেই সঠিকভাবে ও সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি নতুন বৌদ্ধিক জ্ঞানের প্রয়োজন।

উইলসন মন্তব্য করেন :

There should be a science of administration which shall seek to straighten the paths of government, to make its business less unbusinesslike, to strengthen and purify its organisation, and to crown its duties and dutifulness.[২]

প্রাচীন যুগের প্রশাসন (Ancient Administration) : আগেই বলা হয়েছে, যে সরকারী কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রশাসনের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের সিন্ধু সভ্যতার (খ্রিস্ট পূর্ব ২৫০০) যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় তার থেকে পরিষ্কার যে সেই সময়ে নগর-পরিকল্পনা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। স্বভাবতই একটি উন্নত প্রশাসনিক কাঠামো ছাড়া ঐ ধরনের নগর-পরিকল্পনা সম্ভব নয়। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতাতেও দেখা যায় যে উঁচু পিরামিডের সাহায্যে নীলনদের প্লাবনকে সেচ কাজে ব্যবহার করা হত। প্রাচীন চিনে হুন বংশীয় রাজারা (খ্রিস্ট পূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতক) কনফুসীয় ধারণা অনুযায়ী মনে করতেন যে, সরকারী কাজ করার জন্য গুণী ব্যক্তিদের নিয়োগ করা উচিত। জনগণের সার্বিক সুখকে মাথায় রেখে তাই হুন বংশীয় রাজারা কর্মক্ষম, গুণী ব্যক্তিদের প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করতেন।

প্রখ্যাত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলো যেমন গ্রীস, রোম, হোলি রোমান, স্পেন মূলত 'প্রশাসনিক সাম্রাজ্য' (Administration Empire) ছিল।[৩] এই বিরাট সাম্রাজ্যগুলো একটি কেন্দ্র থেকে আইনকানুন, রীতিনীতির সাহায্যে পরিচালিত হত অর্থাৎ সরকারের প্রশাসনিক দিকটিই এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেত।

প্রাচীন যুগের প্রশাসনের একটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখা উচিত। সে যুগের প্রশাসন ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক—একজন ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য, দায়িত্বশীলতা, দায়বদ্ধতা ছিল প্রধান। অনেক সময়েই এর থেকে প্রশাসনের দুর্নীতি, ব্যক্তিস্বার্থে পদের অপব্যবহার, এগুলো গড়ে উঠত। বস্তুত, এইগুলো যে প্রশাসনের অবাঞ্ছিত দিক—তা প্রাচীন অভিজ্ঞতাই আমাদের শিখিয়েছে। এছাড়া সেই যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেক সময়েই ছিল অদক্ষ এবং সঠিকভাবে কাজ করতে অক্ষম, কারণ সেই সময়ে প্রশাসনের কাজে যারা জড়িত থাকতেন তাদের নির্দিষ্ট কোনো নিয়োগ-নীতি ছিল না। চেনা-জানা, বন্ধু, আত্মীয় প্রভৃতিদের মাধ্যমে নিয়োগ হত। ফলে একদিকে যেমন নিয়োগ-সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোনো নীতি ছিল না, তেমনই যারা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত হতেন তারা যে দক্ষ হবেনই তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

সুতরাং প্রশাসন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব, নীতি বা মডেল যেমন আধুনিক যুগে জনপ্রশাসনের বৌদ্ধিক চর্চা ও গবেষণার অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে তেমনই আধুনিক জনপ্রশাসনের ব্যবহারিক দিকটিও কিছুটা প্রাচীন যুগের প্রশাসনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং কিছুটা আধুনিক জনপ্রশাসনের বৌদ্ধিক চর্চার প্রেক্ষিতে নিজেকে গড়ে তুলেছে।

জনপ্রশাসনের সংজ্ঞা (Definition of Public Administration) : জনপ্রশাসন আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে ক্রমাগত প্রভাবিত করে চললেও জনপ্রশাসন বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়। বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে দুটি দিকের ওপর আলোকপাত করা দরকার : একটি হল 'জন' (Public) অংশটি, অন্যটি হল 'প্রশাসন' অংশটি (Administration)।

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতের উল্লেখ করা যেতে পারে। লিওনার্ড হোয়াইটের[৪] (Leonard White) মতে জননীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন তাকে 'জনপ্রশাসন' বলে। উইল্‌সনের মতে আইনের বিস্তারিত এবং সুশৃঙ্খল প্রয়োগকে 'জনপ্রশাসন' বলে।

ডিমকের[৫] (Dimock) মতে সক্রিয় আইন হল 'জনপ্রশাসন'। এটি সরকারের শাসনসংক্রান্ত দিকটিকে চিহ্নিত করে। শাসন বিভাগের প্রশাসনিক দিকটিকে জনপ্রশাসন হিসেবে উল্লেখ করেছেন সাইমন (Simon)। ফিফ্‌নারের (Pfiffner) মতে জনগণ ও সরকার সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে যেভাবে সরকারী লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করে তাকেই 'জনপ্রশাসন' বলে।[৬] নিগ্রোর[৭] মতে (F.A.Nigro) 'জনপ্রশাসন' :

(ক) জনপ্রেক্ষাপটে সম্মিলিত গোষ্ঠীর প্রয়াস,

(খ) সরকারের তিনটি বিভাগকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে,

(গ) নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এবং সেই কারণে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠে,

(ঘ) বেসরকারী প্রশাসনের সঙ্গে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে এবং বেসরকারী প্রশাসনের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ,

(ঙ) সাম্প্রতিক কালে মানব-সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত,

(চ) সমাজকে বিভিন্নভাবে পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে।

Politics-Administration dichotomy সমর্থন করেন।

'PPP' কে সমর্থন করা।

• নিগ্রো Public and Private Ad. এর পার্থক্য সমর্থন করেন।

• Human Relation App. সমর্থন করেন।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতকে গুরুত্ব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, জনগণের জন্য, জনগণের অর্থে সরকারের দলীয় রাজনীতি বহির্ভূত আমলাতান্ত্রিক নীতির বাস্তবায়নকে 'জনপ্রশাসন' বলে। যেহেতু এটি জন-প্রশাসন, তাই বেসরকারী (Private) প্রশাসনের সঙ্গে এর প্রক্রিয়াগত পার্থক্য ছাড়াও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে বিষয় হিসেবে জনপ্রশাসন যথেষ্ট সম্পর্কযুক্ত তবে এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী বিশেষীকৃত (specialised)। এ ছাড়া বিষয়গত দিক থেকে জনপ্রশাসন অর্থনীতি (Economics) ও ব্যবস্থাপনের (Management) সঙ্গে সম্পর্কিত।

সরকারের সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিবিদরা কীভাবে, কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কীসের প্রভাবে নীতি নির্ধারণ করেন তা জনপ্রশাসন আলোচনা করে এবং এই গৃহীত নীতিগুলো কীভাবে প্রশাসকেরা রূপায়িত করে তাও জনপ্রশাসন আলোচনা করে। সেই কারণেই জনপ্রশাসনের আলোচনায় একদিকে যেমন নীতিগ্রহণকে ঘিরে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা তত্ত্ব আলোচিত হয়, তেমনই আমলাতন্ত্রকে ঘিরেও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে ১৯৯০ এর পর থেকে সারা বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও অপরদিকে ইউরোপীয় জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের ব্যর্থতা 'বৃহদাকার' ও 'দায়িত্বশীল' সরকারের জনপ্রিয়তা কমায়। উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রভাবে অধিকাংশ রাষ্ট্রের সরকার অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে থাকে। এর ফলে প্রশাসনের কোন্ অংশটি জনপ্রশাসন, কোন্‌টিই বা বেসরকারী প্রশাসন, এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য কী—এগুলো নতুনভাবে আলোচিত হতে থাকে। 'প্রশাসন' বলতে সনাতনী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বোঝানো হবে, না কি আধুনিক ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠান আলোচিত হবে ইত্যাদি জনপ্রশাসনের আলোচনায় নতুন দিক খুলে দিচ্ছে। প্রশাসনের সঙ্গে নীতি-নির্ধারণের সম্পর্ক এবং ব্যবস্থাপনের সম্পর্ক আলোচিত হচ্ছে। এই বহু ধরনের নতুন আলোচনা সাম্প্রতিক কালে জনপ্রশাসনকে আরও জটিল করে তুলছে।

জনপ্রশাসন—কলা না বিজ্ঞান? (Public Administration—An Art or Science?) : ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে জনপ্রশাসন একটি বৌদ্ধিক আলোচনার বিষয় হলেও তার একটা ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে।

তা সত্ত্বেও লক্ষণীয় যে ভারতসহ অধিকাংশ রাষ্ট্রে স্বতন্ত্র বিদ্যাচর্চার বিষয় হিসেবে জনপ্রশাসন তেমন সমাদৃত হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর জন্ম ও বড় হওয়া—সেই কারণে সে দেশে এটি আলোচনার জন্য কিছুটা সমাদৃত ও আকর্ষণীয়। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে থাকলেও এটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে তেমন সমাদর পায় নি।

ভারতে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে পড়ানো হয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর—কোনো পর্যায়েই এটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে জনপ্রিয়তা পায় নি। জাতীয় স্তরে Indian Institute of Public Administration নামে একটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও এবং সেখান থেকে Indian Journal of Public Administration নামে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হলেও সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো 'জনপ্রশাসন' বিষয়টি তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি।

স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, জনপ্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত অর্থাৎ জনপ্রশাসনকৃত্যক বা আমলাতন্ত্র, তার আয়তন সুবৃহৎ হলেও বিষয়টিকে শিক্ষণীয় হিসেবে যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই আপাত বিভাজন স্মরণ করিয়ে দেয়, জনপ্রশাসনকে দুটি দিক থেকে অনুধাবন করা সম্ভব : একটি হল তার বৌদ্ধিক দিক বা তার বিজ্ঞানের দিক এবং অপরটি হল তার ব্যবহারিক দিক বা তার কলার দিক।

বৃহত্তর অর্থে বিজ্ঞান বলতে একটি বিশেষীকৃত জ্ঞানকে বোঝায়। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে সেই দিক থেকে বিচার করলে জনপ্রশাসন এক ধরনের বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে সাধারণ অর্থে বিশেষ জ্ঞানকেই বোঝায় না, বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক বিষয় বলতে এমন একটি বিষয় বা এমন একধরনের জ্ঞানচর্চাকে বোঝায় যার মূলে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তিনটি প্রধান উপাদান বা পর্যায় আছে : পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও আরোহণ। এই তিনটি পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা Scientific Laws তৈরী করা হয় যা স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তনশীল নয়। এইভাবে তৈরী হয় বিশ্বজনীন জ্ঞান এবং তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বিজ্ঞান।

জনপ্রশাসনের সূত্রপাত হিসেবে যে প্রবন্ধটিকে চিহ্নিত করা হয় সেই প্রবন্ধটিতে রচনাকার উড্রো উইল্‌সন্ 'জনপ্রশাসনের বিজ্ঞান' (the science of administration) কথাটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৭ সালে লুথার গুলিক (Luther Gulick) এবং লিন্ডল উরউইক (Lyndall Urwick) 'জনপ্রশাসনে

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ' (Papers on the Science of Administration) শিরোনামে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা লেখেন। টেলর, ফেয়ল, গুলিক, উরউইক প্রমুখেরা একটি সংগঠনের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনের দিকের কতগুলো নীতির কথার উল্লেখ করেন যা অনেকটাই বৈজ্ঞানিক সূত্রের কাছাকাছি। কিন্তু এই নীতির প্রয়োগ কতটা বিশ্বজনীন—অর্থাৎ স্থান-কাল-সংস্কৃতি ভেদে হওয়া সম্ভব, তা সংশয়াধীন।

বস্তুত, মানববিদ্যার কোনো ধারার ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এই ধরনের প্রয়াস যেসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেখানেও বিশ্বজনীন সূত্র তৈরী করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব নয়, কারণ প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে যারা তারা কোনো নিষ্প্রাণ বস্তু বা বুদ্ধিহীন প্রাণী নয়—তারা বুদ্ধি-বিবেচনা-যুক্তি প্রয়োগকারী মানুষ। সংস্কৃতি, পরিবেশ, ভৌগোলিক অঞ্চল, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাশক্তি নিয়ে আসে যার ফলে প্রশাসন সংক্রান্ত এমন কোনো তত্ত্ব দেওয়া সম্ভব নয় যা পৃথিবীর সর্বত্র একইরকম সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়।

জনপ্রশাসনকে তাই একটি কলা-ভিত্তিক বিষয় হিসেবেই চিহ্নিত করা উচিত; যদিও নিঃসন্দেহে এটি একটি বিশেষীকৃতজ্ঞান এবং সেই নিরিখে বিজ্ঞান।

জনপ্রশাসনের পরিধি (Scope of Public Administration) : সংসদ বাংলা অভিধানে 'প্রশাসন' শব্দটির অর্থ হিসেবে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্রের শাসন-সংক্রান্ত'। ওই একই অভিধানে 'শাসন' শব্দটির বহুবিধ অর্থ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে 'সুব্যবস্থার সহিত প্রতিপালন', 'পরিচালনা' এবং 'রাজ্য পরিচালনা' ইত্যাদি রয়েছে। এই শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে প্রশাসন বলতে কী বোঝায়, তা বোঝা গেলেও একটু খুঁটিয়ে দেখলে লক্ষ্য করা যায় যে প্রশাসন বিষয়বস্তুটি কী নিয়ে আলোচনা করে তা' তেমনভাবে বোঝা যায় না। এ প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে প্রশাসন (Administration) এবং পরিচালন বা ব্যবস্থাপন (Management) বিদ্যাচর্চার বিষয়বস্তু হিসেবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জনপ্রশাসনের পরিধি আলোচনা করতে গেলে সেই কারণে দুটি দিকের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনের পার্থক্য কী এবং দ্বিতীয়ত, জন-প্রশাসন কোন্ কোন্ দিক থেকে বেসরকারী প্রশাসনের থেকে ভিন্ন। এই দুটি দিক আলোচনা করলেই জনপ্রশাসন কী আলোচনা করে না, সে বিষয়ে

একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। তার থেকেই জনপ্রশাসনের পরিধিও নির্ধারিত করা সম্ভব হবে।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপন (Administration and Management) : ব্যবস্থাপন আজ একটি প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানচর্চার বিষয়। আভিধানিক অর্থের দিক থেকে 'ব্যবস্থাপন' ও 'প্রশাসন' দুটি শব্দই কাছাকাছি হলেও প্রশাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বের থেকে ব্যবস্থাপন-সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বের ভিন্নতা বিষয়টির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, 'প্রশাসন' শব্দটি শাসন শব্দটির সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলো সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে; অপরদিকে, ব্যবস্থাপনের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা বা আয়োজন সংক্রান্ত বিষয়গুলো মুখ্য হয়ে ওঠে। এই পার্থক্যের থেকে প্রশাসন কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। একটি কাজ করতে গেলে যে বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিষেবা দেওয়া হয় তাকেই প্রশাসন বলে।

প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপন—এই দুইয়ের মধ্যে প্রশাসনকেই বৃহত্তর আলোচনার বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। রোসেনব্লুমের[৮] (Rosenbloom) মতে জনপ্রশাসন হল বৃহত্তর বিষয় এবং এটি ব্যবস্থাপন-সংক্রান্ত, আইনগত ও রাজনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে সরকারের আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের নির্দেশগুলো সমগ্র সমাজে প্রয়োগ করে। ওট, হাইড্ এবং শাফরিজ্[৯] (Ott, Hyde and Shafritz) প্রশাসনের একটি উপশাখা হিসেবে ব্যবস্থাপনকে গণ্য করেন এবং মনে করেন যে এই উপশাখাটি প্রশাসনের কর্মসূচী ও নীতির ব্যবহারিক পদ্ধতিবিদ্যার আলোচনা করে।

হিউজের (Hughes)[১০] মতে প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনের ধারণাগত কিছু পার্থক্য থাকলেও, দুটিকে পৃথক বিষয় হিসেবে গণ্য করা ঠিক নয়। দুটি বিষয়ই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এবং বিষয়দুটি একে অপরের পরিপূরক।

জনপ্রশাসনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনের পার্থক্য জানা যেমন প্রয়োজন তেমনই জনপ্রশাসন এবং বেসরকারী প্রশাসনের পার্থক্য জানাও দরকার।

জনপ্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসন (Public Administration and Private Administration) : বেশ কিছু তাত্ত্বিক—যেমন উরউইক (Urwick), ফেয়ল (Fayol), ফোলেট (Follett) মনে করেন যে প্রশাসনকে জনপ্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসন, এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করা যায় না। প্রশাসন একটি অবিভাজ্য

একক এবং প্রশাসনের নীতিগুলোকে সমান সাফল্যের সঙ্গে জনপ্রশাসনে এবং বেসরকারী প্রশাসনে প্রয়োগ করা যায়।

জনপ্রশাসন বলতে মূলত সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়; অপরদিকে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনস্থ সংগঠনের প্রশাসনকে বেসরকারী প্রশাসন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই দুটি প্রশাসনিক ক্ষেত্র যে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র তা কখনোই নয়। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো দুই ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেই থাকে। যেমন হিসাব-রক্ষা, হিসাব-নিরীক্ষা, অফিস পরিচালনা, পরিসংখ্যান-রক্ষা ইত্যাদি কাজগুলো জনপ্রশাসন এবং বেসরকারী প্রশাসন উভয় ব্যবস্থাতেই থাকে।

এছাড়া আরও লক্ষণীয় হল শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রসারণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জনপ্রশাসনের এতটাই বৃদ্ধি ঘটেছে যে জনপ্রশাসন এবং বেসরকারী প্রশাসনের বিভাজনরেখা ক্রমশই মুছে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে গ্রেট ব্রিটেনসহ বেশ কিছু ইউরোপীয় রাষ্ট্র কল্যাণবাদী অর্থনীতি গ্রহণ করে। এই অর্থনীতির মূলে রয়েছে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা যা রাষ্ট্রেই গ্রহণ করবে ও রূপায়ণ করবে। পরবর্তীকালে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এই মতবাদ গ্রহণ করে। ফলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্মমুখিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং জনপ্রশাসনের কাজের চাপ অনেক বাড়ে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসনকে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে কাজ করতে হয়।

১৯৭০ এর দশক থেকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোয় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেই সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসনের বিভিন্ন দিক সমালোচিত হতে থাকে। আমলাতন্ত্রের অতিরিক্ত বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অনেকেই সরব হন। 'জন পছন্দ' (Public Choice) গোষ্ঠী আমলাতন্ত্রের সীমিতকরণের কথা বলতে থাকে। সাধারণভাবে, জনপ্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিকতা, লাল ফিতের ফাঁস ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এবং ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোনাল্ড রেগন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে সঙ্কুচিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; স্পেন, ইতালি, জার্মানী, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলোতেও বেসরকারী ক্ষেত্র বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিধি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং জনপ্রশাসনের সংকোচনের ক্ষেত্রে বহুবিধ কারণ থাকলেও সরকারী ক্ষেত্রের অদক্ষতা ও দীর্ঘসূত্রতাকে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হয়েছিল। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আমলাতন্ত্র প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারী কাজকর্ম বহুক্ষেত্রেই সমালোচিত হচ্ছিল এবং বেসরকারী সংস্থার কাজকর্ম তথা বেসরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অনেক বেশী দক্ষ, কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ভাবা হয়েছিল।

জনপ্রশাসনের দুর্বলতা এবং বেসরকারী প্রশাসনের যে সাফল্যের কথা ১৯৮০র দশক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বলা হচ্ছিল তার থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট—তা হল জনপ্রশাসন এবং বেসরকারী প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং দুটিকে কিছুটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত।

প্রথমত, বেসরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে লাভ বা মুনাফা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। বেশ কিছু বেসরকারী সংস্থা আছে যেগুলো জনগণকে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই সংস্থাগুলো যদি সম্পূর্ণভাবে অলাভজনক হয় তাহলে সেই সংস্থাগুলোকে টিকিয়ে রাখা হয় না। অপরদিকে সরকারী সংস্থা লাভ বা মুনাফার মুখ চেয়ে কাজ করে না। মূলত, এই সংস্থাগুলো পরিষেবামূলক। ফলে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয়ত যেহেতু এই দু'ধরনের সংস্থার মধ্যে প্রকৃতি, অভীষ্ট লক্ষ্য এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য অনেক, ফলে কাজের প্রকৃতিও দু'ধরনের সংস্থার ক্ষেত্রে ভিন্ন। বেসরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দ্রুত কাজের নিষ্পত্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়; অপরদিকে জনপ্রশাসনে নিয়ম-বিধির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার জন্ম দেয়।

তৃতীয়ত, বাস্তব প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসনের পরিধি অপরিসীম। সরকারের কিছু কিছু কাজ এমন ধরনের যে বেসরকারী প্রসাশনের সঙ্গে তা কখনোই তুলনীয় নয়। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কাঠামোর সাহায্য নিতে হয় যেমন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী, যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেল-ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই ব্যবস্থাগুলোর প্রশাসনিক কাজের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে বেসরকারী প্রশাসন কখনোই তুলনীয় নয়।

চতুর্থত, উন্নয়নশীল, জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের পরিধি আরও বিস্তৃত। এইসব রাষ্ট্রে জনগণের সামাজিক দায়িত্বগুলোও রাষ্ট্রের ওপর থাকে বলে ডাক-ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বীমা পরিষেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা—এগুলোও জনপ্রশাসনের আওতার মধ্যে পড়ে। এমনকি শিল্পের পরিকাঠামো নির্মাণ তার উন্নয়ন, বিপণন ইত্যাদিও রাষ্ট্রই করে থাকে। ফলে এইসব রাষ্ট্রে বেসরকারী প্রশাসনের সুযোগ ও পরিধি অনেক কম।

পঞ্চমত এবং সবশেষে বলা যায় যে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিয়মনির্ভরতার কথা আগে বলা হলেও বলা প্রয়োজন যে নিয়মকানুন জনপ্রশাসনের একটা অঙ্গ। কোনো অবস্থাতেই নিয়মকানুনের বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ জনপ্রশাসনের পক্ষে সম্ভব নয়; বস্তুত তা করা হলে সেই সিদ্ধান্তটিকে বেআইনি বলা হবে। এই ধরনের বাধ্যবাধকতা বেসরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে থাকে না। বেসরকারী প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে সাফল্য-কেন্দ্রিক এবং সাফল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংস্থার মুনাফাই প্রধান নির্ণায়ক।

এই পার্থক্যগুলো থাকলেও জনপ্রশাসন এবং বেসরকারী প্রশাসনকে দু'ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। বরং এই দুটিকে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার দুটি দিক হিসেবে দেখা উচিত। যেহেতু এই দুই ব্যবস্থার লক্ষ্য এবং দায় ভিন্ন সেই কারণেই এই দুই ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপন এবং জনপ্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসন—এই দু'ধরনের আলোচনার মধ্য দিয়ে জনপ্রশাসন কী নিয়ে আলোচনা করে এবং কী নিয়ে করে না, সে বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া গেল। জনপ্রশাসনের নির্দিষ্ট পরিধি আলোচনা করা সেই কারণে এবার সহজ হবে।

জনপ্রশাসনের আলোচনায় 'জন' (Public) শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জনপ্রশাসন মূলত রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রটি নিয়েই আবর্তিত। জনগণের অর্থের সাহায্যে সার্বিক জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য যে নিয়মাবলী, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকে, সেগুলোই জনপ্রশাসনে আলোচিত হয়।

ফিফ্‌নারের [১১] (Pfiffner) মতে জনপ্রশাসন সরকার কী কী কাজ করে (what) এবং কীভাবে করে (how) তা' নিয়ে আলোচনা করে। জনপ্রশাসন

সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনার থেকে আমরা বলতে পারি যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জনপ্রশাসনের আলোচনায় এসে থাকে।

(১) সরকার যে কাজগুলো করে থাকে অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণ, নীতি নির্ধারণ এবং এগুলোর ভিত্তিতে একটি কাজ করার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেগুলো জনপ্রশাসনের আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে।

(২) সরকার ও সরকারী সংগঠনের কাঠামো ও কর্মীদের আলোচনা জনপ্রশাসনের মধ্যে পড়ে। দক্ষ প্রশাসনের জন্য কী ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজন, কী ধরনের কাঠামো রয়েছে, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি জনপ্রশাসনে আলোচিত হয়। এছাড়া, কর্মীদের নিয়োগ-পদ্ধতি, বেতনক্রম, পদোন্নতি, বদলি-নীতি ইত্যাদিও এই বিষয়টিতে আলোচিত হয়।

(৩) প্রশাসনিক ব্যক্তিরা যে কাজগুলো করে থাকেন, তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় সেগুলোও জনপ্রশাসনের আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রশাসনিক দায়িত্ব, নেতৃত্ব, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো জনপ্রশাসনে আলোচিত হয়।

(৪) যেহেতু বিষয়টি জনপ্রশাসন সেই কারণে প্রশাসন কীভাবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে অর্থাৎ প্রশাসনের আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগ প্রশাসনের ওপর কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে সেগুলোও জনপ্রশাসনের আলোচনার আওতার মধ্যে পড়ে।

এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে গিয়ে জনপ্রশাসনে বিভিন্ন তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেসব তত্ত্ব প্রচলিত ছিল সেগুলো সাবেকী বা (traditional) সনাতনী তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। এই তত্ত্বগুলোর অধিকাংশ মার্কিন রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল। ১৯৬০ এর দশক থেকে জনপ্রশাসনের ইঙ্গ-মার্কিন কাঠামো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। প্রশাসন পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব গুরুত্ব পেতে থাকে। প্রশাসনের এই পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম

তুলনামূলক জনপ্রশাসন, নব জনপ্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এই বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রশাসনের আলোচনায় এসে পড়ে।

স্টিফেন বেইলির[১২] (Stephen Bailey) মতে জনপ্রশাসনের আলোচনায় চার ধরনের তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়।

(১) **বর্ণনামূলক (Descriptive) তত্ত্ব**—এই ধরনের তত্ত্বে বিভিন্ন ক্রমোচ্চ-স্তরবিন্যস্ত কাঠামোর বর্ণনা এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা আলোচিত হয়।

(২) **আদর্শমূলক (Normative) তত্ত্ব**—এই ধরনের তত্ত্ব কী করা উচিত তার ওপর জোর দেয়। জনপ্রশাসনকে ব্যবহারিক দিক থেকে যাঁরা প্রয়োগ করেন তাঁরা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিকল্প সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে কোন্‌টিকে গ্রহণ করবে, সে সর্ম্পকে এই তত্ত্ব আলোচনা করে। এমনকি, জনপ্রশাসন বিষয়টি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা কোন্ কোন্ দিক চর্চা করবেন এবং বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে কী ধরনের প্রস্তাব দেবেন, সে সম্পর্কেও এই ধরনের তত্ত্ব আলোচনা করে।

(৩) **ধারণামূলক (Assumptive) তত্ত্ব**—এই ধরনের তত্ত্ব প্রশাসনিক কৃত্যক সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই ধরনের তত্ত্ব আমলাতন্ত্রকে কোনো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবেও দেখে না বা বর্জনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবেও গণ্য করে না। নৈর্বক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমলাতন্ত্রকে পর্যলোচনা করে এই ধরনের তত্ত্ব।

(৪) **যান্ত্রিক (Instrumental) তত্ত্ব**—জনপ্রশাসনকে লক্ষ্যকেন্দ্রিক এবং সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এই ধরনের তত্ত্ব ব্যবস্থাপন শাস্ত্রের কিছু কিছু কৌশলকে প্রয়োগ করতে চায়।

বেইলি যে চার ধরনের তত্ত্বের কথা বলেছেন তার ভিত্তিতে জনপ্রশাসনের তিনটি প্রধান স্তম্ভ চিহ্নিত করা যায় :

(১) বিভিন্ন সংগঠনের আচরণ এবং বিভিন্ন সরকারী সংগঠনে কর্মীদের আচরণ;

(২) ব্যবস্থাপনের কৌশল ও প্রয়োগ এবং নীতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান;

(৩) জনস্বার্থ।

জনপ্রশাসনের বিবর্তন (Evolution of Public Administration) : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জনপ্রশাসনের ব্যবহারিক দিকটি অর্থাৎ তার বাস্তব প্রয়োগ বহু পুরোনো হলেও, একটি শাস্ত্র বা জ্ঞানচর্চার বিষয় হিসেবে এর বয়স একশো বছরের কিছু বেশী।

১৮৮৭ সালে প্রকাশিত উড্রো উইলসনের "The Study of Administration" প্রবন্ধটির মাধ্যমে জনপ্রশাসন বিষয়টির সূত্রপাত ঘটে বলে মনে করা হয়। গবেষকরা পরবর্তীকালে এই রচনাটিকে বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করেন। মনে করা হয় যে এই প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক কাজ এবং প্রশাসনিক কাজ—এই দুইয়ের মধ্যে বিভাজনরেখা টানা হয়। এটিকে রাজনীতি-প্রশাসন বিভেদ (Politics-Administration Dichotomy) বলা হয়। জনপ্রশাসনের উদ্ভব এবং বিবর্তনের ইতিহাসে এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে 'রাজনীতি-প্রশাসন বিভেদ' বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই জনপ্রশাসনের প্রথম পর্বটিকে চিহ্নিত করা হয়।[১৩]

Politics-Administration dichotomy Period

(ক) প্রথম পর্ব : রাজনীতি-প্রশাসন বিভাজন (১৯০০-১৯২৬) : উইলসনের প্রবন্ধের মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই এই পর্বটিকে চিহ্নিত করা হয় অর্থাৎ এই পর্যায়টিতে প্রশাসনকে রাজনীতির থেকে স্বতন্ত্র একটি বিষয় হিসেবে ভাবা হয়। ১৯০০ সালে জনপ্রশাসনের বিবর্তনের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ঘটে। ফ্র্যাঙ্ক জে. গুডনাউ এবং লিওনার্ড ডি. হোয়াইটের (Frank J. Goodnow and Leonard D. White) Politics and Administration বইটি এই বছর প্রকাশিত হয়।

গুডনাউয়ের মতে সরকারের দুটি স্বতন্ত্র কাজ আছে : প্রথমটি রাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কিত যেটি রাজনৈতিক কাজ এবং দ্বিতীয়টি সেই নীতির রূপায়ণ সম্পর্কিত যেটি প্রশাসনিক কাজ। সরকারের আইনবিভাগ, বিচারবিভাগের সাহায্য নিয়ে প্রথম কাজটি অর্থাৎ রাজনৈতিক কাজটি করে থাকে, অপরদিকে শাসনবিভাগ, আমলাতন্ত্রের সাহায্যে দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ প্রশাসনিক কাজটি করে থাকে।

এই পর্বের আলোচকরা জনপ্রশাসনের আধার (locus) নিয়েই বেশী চর্চা করেছেন। গুডনাউয়ের মতে সরকারের আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানটিই জনপ্রশাসনের মূল আধার। আইনবিভাগ মূলত রাষ্ট্রের ইচ্ছা কী, তা আলোচনার মধ্যে দিয়ে ঠিক করে; বিচারবিভাগ সেই রাষ্ট্রীয় ইচ্ছা বা নীতির রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করে; অপরদিকে শাসনবিভাগ রাষ্ট্রকৃত্যকদের সাহায্যে সেই নীতিগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করে। এইভাবে জনপ্রশাসন ও রাজনীতির মধ্যে বিভাজন টানা হয় এবং 'রাজনীতি-প্রশাসন বিভেদ' হিসেবে পর্বটি চিহ্নিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'রাষ্ট্রকৃত্যক আন্দোলন' গড়ে ওঠে যার ফলে জনপ্রশাসন স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পেতে থাকে। ১৯১২ সালে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সংস্থা জনকৃত্যকদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য একটি কমিটি তৈরী করে। এই কমিটি ১৯১৪ সালে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনে জনপ্রশাসকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়।

এই সময়ে জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিক এবং গবেষকদের সঙ্গে জনপ্রশাসনের কর্মীদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্থানীয় সরকারী কাজকর্মকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ১৯০৬ সালে Newyork Bureau of Municipal Research প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১১ সালে এই সংস্থাই জনপ্রশাসনের প্রথম স্কুল তৈরী করে যেটি Training School for Public Service নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত, জনপ্রশাসন চর্চার ক্ষেত্রে দুই বিশিষ্ট তাত্ত্বিক চার্লস বেয়ার্ড (Charles Baird) এবং লুথার গুলিক (Luther Gullick) এই প্রশিক্ষণ স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিকর্তা হন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে জনপ্রশাসকদের সঙ্গে জনপ্রশাসনের গবেষকদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ১৯২৪ সালে এই প্রশিক্ষণ স্কুলটি Syracuse University-র অধীনে Maxwell School of Citizenship and Public Affairs নামে পরিচিত হয়।

সময়ের দিক থেকে বিচার করলে এই পর্বের দু'টি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হল ফ্রেডেরিক টেলরের (Frederick W. Taylor) Principles of Scientific Management (১৯১১) এবং অঁরি ফেয়লের (Henry Fayol) General and Industrial Management (১৯১১)। কিন্তু বিষয়গত দিক থেকে বই দু'টি 'রাজনীতি-প্রশাসন বিভাজনে'র চেয়েও যে দিকটার ওপর গুরুত্ব আরোপ

করে তা' হল সংগঠন দক্ষতা বাড়াবার জন্য প্রশাসনে বিশ্বজনীন নীতির প্রয়োগ। এই কারণে বই দু'টির আলোচনা প্রথম পর্বে না রেখে দ্বিতীয় পর্বে রাখা হল।

সমান্তরালভাবে জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে ১৯২৬ সালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বছরেই লিওনার্ড ডি. হোয়াইটের (Leonard D. White) Introduction to the Study of Public Administration বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটি রাজনীতি-প্রশাসন বিভেদটিকে আরও সুস্পষ্টরূপ দেয়। হোয়াইটের মতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজনীতির হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই। একটি নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞান হিসেবে জনপ্রশাসন গড়ে উঠতে সক্ষম এবং জনপ্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হল ব্যয়সংকোচ এবং দক্ষতা।

(খ) দ্বিতীয় পর্ব : নীতি-নির্ভর প্রশাসন (১৯২৭-১৯৩৭) :

১৯২৭ সালকে জনপ্রশাসনের বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয় কারণ ওই বছরই উইলোবি (W. F. Willoughby) প্রণীত Principles of Public Administration বইটি প্রকাশিত হয়। জনপ্রশাসনের আলোচনায় হোয়াইটের বইটির পরই এই বইটিকে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হিসেবে গণ্য করা হয়। হোয়াইটের মতোই এই বইটিও মার্কিন প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও বইটির দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন।

জনপ্রশাসনের আলোচনাকে এই সময় থেকেই বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। মনে করা হয় যে জনপ্রশাসনের আলোচনায় কতগুলো বিজ্ঞানসম্মত নীতি আছে যেগুলো প্রকাশ করা সম্ভব। এই নীতিগুলো যদি সচেতনভাবে উপযুক্ত পরিবেশে প্রশাসকরা প্রয়োগ করেন তাহলে কাজে দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব এবং জনপ্রশাসনকেও বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে টেলরের Principles of Scientific Management বইটি সংগঠনে দক্ষতা বাড়াবার জন্য কতগুলো নীতি প্রয়োগের কথা বলে। টেলর ছাড়াও গ্যান্ট (Gantt), গিলবার্ট (Gilbert) প্রমুখেরা একইভাবে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াবার জন্য বৈজ্ঞানিক নীতি প্রয়োগের কথা বলেন। সামগ্রিকভাবে এঁদেরকে 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপন গোষ্ঠী' বা Scientific Management School বলা হয়। এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক নীতির ওপর ভিত্তি করে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাঁরা যে নীতিগুলোর কথা বলেন সেগুলো প্রধানত প্রশাসনিক কাঠামোর নিম্নস্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

জনপ্রশাসনের বৌদ্ধিক চর্চার দিকটি এই সময়ে তুঙ্গে ওঠে। বেশ কিছু তাত্ত্বিকদের রচনা যেমন অঁরি ফেয়লের (Henry Fayol) General and Industrial Management (১৯১৬), মেরি পার্কার ফলেটের (Mary Parker Follett) Creative Experience (১৯২৪), জেম্‌স্ মুনি ও অ্যালান রেইলের (James D. Mooney and Alan Reiley) Principles of Organization (১৯৩৯) জনপ্রশাসনের বিশ্বজনীন নীতির ওপর গুরুত্ব দেয়। জনপ্রশাসনের আধার (locus) এই পর্বেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মনে করা হত যে প্রশাসনের কতগুলো নীতি আছে যেগুলো যেকোনো ধরনের প্রশাসনিক কাঠামোয়—তা সে যে ধরনেরই সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে হোক না কেন প্রয়োগ করা যায়। জনপ্রশাসনের সঙ্গে বেসরকারী প্রশাসনের কোনো পার্থক্য এই পর্বে করা হয় নি।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষ করা যাক ১৯৩৭ সালে গুলিক ও উরউইকের (Luther H. Gulick and Lyndall Urwick) Papers on the Science of Administration বইটির কথা উল্লেখ করে। প্রশাসনিক নীতির সবচেয়ে প্রচলিত নীতিসমূহ POSDCORB গুলিক-উরউইকের রচনাতেই পাওয়া যায়।

POSDCORB বলতে বোঝায় :

P lanning	—	পরিকল্পনা
O rganising	—	সংগঠন
S taffing	—	কর্মী নিয়োগ
D irecting	—	নির্দেশনা/সঞ্চালনা
C		
O rdinating	—	সমন্বয়-সাধন
R eporting	—	প্রতিবেদন প্রকাশ/খবর দেওয়া
B udgeting	—	আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পেশ

(গ) তৃতীয় পর্ব : নীতি-নির্ভর প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ (১৯৩৮-১৯৪৭) :

যেভাবে নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে জনপ্রশাসন এতদিন ধরে গড়ে উঠেছিল তা ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত Chester I. Barnard-এর 'The Functions of the Executive' বই প্রকাশের মধ্যে দিয়ে কিছুটা বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

হয়। মূলত, দুটি দিক থেকে জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। প্রথমত, যেভাবে রাজনীতি ও জনপ্রশাসনের মধ্যে বিভাজনরেখা টানা হচ্ছিল, তা বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয় বলে নতুন প্রজন্মের তাত্ত্বিকেরা মনে করছিলেন। দ্বিতীয়ত, ১৯৪০ সাল থেকে যেসব তাত্ত্বিক রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল তাতে প্রশাসনিক নীতিসমূহ সমালোচিত হয়। প্রশাসনের মধ্যে বিশ্বজনীন, চূড়ান্ত নীতি পাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে।

১৯৪৬ সালে F. M. Marx-এর সম্পাদনায় Elements of Public Administration নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটিতে চোদ্দোটি প্রবন্ধ থাকে যার প্রতিটিই জনপ্রশাসনের প্রায়োগিক ব্যক্তিরা লিখেছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের প্রবন্ধের মাধ্যমে রাজনীতি ও জনপ্রশাসনের যে বিভেদরেখা এতদিন প্রচলিত ছিল তার অসারতা তুলে ধরেন। মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ একটি বিষয় হিসেবে জনপ্রশাসনকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছিল, তাকে এই প্রবন্ধকারেরা প্রত্যেকেই অস্বীকার করেন।

একই সময়ে ১৯৪৭ সালের হার্বার্ট সাইমনের (Herbert Simon) বিখ্যাত বই Administrative Behaviour : A Study of Decision-making Processes in Administrative Organization প্রকাশিত হয়। সাইমনের মতে জনপ্রশাসনের কোনো নীতি থাকতে পারে না; প্রচলিত নীতিসমূহকে তিনি প্রবচন আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করেন। সাইমন তাঁর বইতে দেখান যে প্রচলিত যে প্রশাসনিক নীতিগুলো আছে তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই একটি করে বিকল্প নীতিও পেশ করা সম্ভব।

একই বছর Public Administration Review পত্রিকায় রবার্ট ডাহ্‌ল (Dahl) 'The Science of Public Administration : Three Problems' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটিতে ডাহ্‌ল জনপ্রশাসনে বিশ্বজনীন নীতি গড়ে তোলার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সংস্থার সাংগঠনিক পার্থক্য, ব্যক্তিত্বের ফারাক বিশ্বজনীন নীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। একই ধরনের বক্তব্য Dwight Waldo-র 'The Administrative State : A Study of the Political Theory of American Public Administration' (1948) বইটিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) চতুর্থ পর্ব : চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া (১৯৪৭-১৯৫০) :

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে মূল স্তম্ভ দুটিকে ঘিরে জনপ্রশাসন গড়ে উঠেছিল, এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই সেই দুটি প্রধান বক্তব্য

জনপ্রশাসন আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। রাজনীতি-জনপ্রশাসনের বিভাজন এবং জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন নীতির প্রয়োগ—এই দুটিই ১৯৫০ সালের সময় থেকে জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিকেরা পরিত্যাগ করতে শুরু করেন।

হার্বার্ট সাইমন (Herbert Simon) জনপ্রশাসনের নীতিগুলোর সমালোচনা করে জনপ্রশাসনের চর্চার প্রচলিত পদ্ধতিকে শুধু বর্জন করার আহ্বান জানাননি; তিনি কীভাবে জনপ্রশাসনকে চর্চা করা উচিত, সে সম্পর্কেও মন্তব্য করেন। সাইমনের মতে দুটি বিষয়ে জনপ্রশাসনের গবেষকদের জোর দেওয়া উচিত। প্রথমত জনপ্রশাসনকে 'প্রশাসনের বিজ্ঞান' (Science of Administration) হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, জননীতি বা Public Policy-র ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনকে মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে, অর্থাৎ কী ধরনের জননীতি হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে জনপ্রশাসন আলোচনা করবে। সাইমনের মতে এই দুই ধরনের গবেষণাই জনপ্রশাসনে সমান্তরাল ভাবে চলতে পারে।

জনপ্রশাসনে এইভাবে গবেষণা করার সম্ভাবনা গবেষক মহলে খুব সাদরে গৃহীত হয় নি। জনপ্রশাসনকে 'প্রশাসনের বিজ্ঞান' করা আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে অনেকেই সন্দিগ্ধ ছিলেন। এছাড়া জনপ্রশাসনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্কটিও সেই সময়ে যথেষ্ট বিতর্কিত আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। একদিকে জননীতিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছিল এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে জনপ্রশাসনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ককে দ্বিমুখী এবং ঘনিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টা ছিল। অপরদিকে 'প্রশাসনের বিজ্ঞান' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিষয়টিকে তার রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্যুত করে একটি মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান করা যায় কিনা তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা হচ্ছিল।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় 'আচরণবাদী বিপ্লব' কিছু বিশেষ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের থেকে বেরিয়ে এসে শুধু জনপ্রশাসনই নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কও স্বতন্ত্র হতে চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাঁর পূর্বেকার সম্মান হারাতে বসে এবং গবেষক মহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মর্যাদার দিক থেকে সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। এই অবস্থায় জনপ্রশাসনের স্থান ঠিক কোথায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র নাকি সম্পর্কযুক্ত—তা নিয়ে জনপ্রশাসনের গবেষকরাও বিব্রত হতে থাকেন যার থেকে জনপ্রশাসন পরবর্তী দুই দশকে কিছুটা মুক্ত হয়।

Connection with Pol. Science and Comparative Administration Era

(ঙ) পঞ্চম পর্ব : জনপ্রশাসন-রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংযোগ (১৯৫০-১৯৭০) :

১৯৫০-এর দশক থেকেই জনপ্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫২ সালে American Political Science Review-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে রস্‌কো মার্টিন (Roscoe Martin) জনপ্রশাসনের আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ আরও বাড়াবার কথা বলেন। এই পর্বের প্রথমদিকে সেই কারণে জনপ্রশাসনকে আরও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নির্ভর করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

এর ফল জনপ্রশাসনের দিক থেকে খুব সুখকর ছিল না। ১৯৬০-এর দশকে দেখা যায় যে বিভিন্ন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রশাসনের যে পাঠ্যসূচী রচিত হয়েছিল, তা এতই বিস্তৃত ও বিভিন্নমুখী যে জনপ্রশাসনের সংজ্ঞা ও আলোচনাও ভীষণ নমনীয় ও প্রসারিত হয়ে ওঠে। তবে এই পর্বে, জনপ্রশাসনের আধার কী বা কোথায় তার অবস্থান—তা কিছুটা স্পষ্ট হয়। সরকারী আমলাতন্ত্রকেই জনপ্রশাসনের মূল আধার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ, গঠন, বিন্যাস—এগুলোই জনপ্রশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

জনপ্রশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে এই অম্লমধুর টানাপোড়েনের মধ্যেই লক্ষণীয় যে দুটি নতুন ধরনের চিন্তা জনপ্রশাসনকে সমৃদ্ধ করে। প্রথমত, জনপ্রশাসনে ক্ষেত্র-সমীক্ষা (Field Survey) এবং তার প্রয়োগ ঘটে। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক প্রশাসন (Comparative Public Administration) এবং উন্নয়ন প্রশাসন (Development Administration) দুটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে জনপ্রশাসনের আলোচনায় গড়ে ওঠে।

এই পর্বের আগেও বিশেষ করে ১৯৪০-এর দশকের মধ্যভাগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জনপ্রশাসনের স্নাতক পর্যায়ের স্কুল ক্ষেত্র-সমীক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি জনপ্রশাসনের আলোচনায় পরবর্তীকালে তেমন সমাদর পায় না। ১৯৭৭ সালে থেকে জনপ্রশাসনের আলোচনায় ক্ষেত্র-সমীক্ষা আবার গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

এরই সঙ্গে জনপ্রশাসনের আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কী ধরনের হতে পারে সে সম্বন্ধে চর্চা এবং তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা শুরু হয়। জনপ্রশাসনের উদ্ভবের দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ যখন জনপ্রশাসনের আলোচনায় নীতিসমূহের গুরুত্ব বেশী ছিল তখন মনে করা

হত যে নীতিগুলোর আবেদন বিশ্বজনীন এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতা তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু ১৯৪০-এর দশকের শেষ ভাগ থেকেই এই ধরনের চিন্তার পরিবর্তন দেখা যায় এবং ১৯৫০-এর দশকের শুরু থেকেই বিভিন্ন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে তুলনামূলক জনপ্রশাসনের অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

১৯৬০ সালে Comparative Administraton Group (CAG) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬২ সালে এই প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক জনপ্রশাসন বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রচুর আর্থিক সাহায্য পায়। তুলনামূলক জনপ্রশাসন মূলত পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গবেষণা চালায় : প্রথমত, তত্ত্ব নির্মাণ; দ্বিতীয়ত, বাস্তবে তা প্রয়োগ করা; তৃতীয়ত, এই বিষয়ে গবেষণার সাহায্যে তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি বিস্তৃত করা; চতুর্থত, প্রশাসনিক আইন সম্পর্কে গবেষণা; এবং পঞ্চমত, জনপ্রশাসনের সমস্যাগুলোর তুলনামূলক আলোচনা।

তুলনামূলক জনপ্রশাসনের উদ্ভব এবং বিবর্তনের ক্ষেত্রে ফ্রেড. ডব্লিউ. রিগ্‌স্ (Fred, W. Riggs)-এর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত রিগ্‌স্ CAG-র সভাপতি ছিলেন এবং তাঁর বৌদ্ধিক নেতৃত্ব এবং গবেষণার মধ্যে দিয়ে তুলনামূলক জনপ্রশাসন সমৃদ্ধ হয়। তুলনামূলক জনপ্রশাসন বিষয়টি তাত্ত্বিক আলোচনায় বেশী নিমগ্ন ছিল। এছাড়া, এই বিষয়ের গবেষণার মধ্যে দিয়ে উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের জনপ্রশাসনকে কীভাবে আরও উন্নয়নমুখী, দক্ষ এবং কার্যকরী করে তোলা যায় তাও আলোচিত হত।

এই পর্বের শেষ দিকের আর একটি উল্লেখযোগ্য জনপ্রশাসনের ধারা গড়ে ওঠে যেটি নব জনপ্রশাসন (New Public Administration) নামে পরিচিত। ১৯৬৮ সালে ডোয়াইট ওয়াল্ডো (Dwight Waldo) জনপ্রশাসনের তরুণ গবেষকদের নিয়ে আলোচনা-সভা করেন এবং এই আলোচনা-সভার বক্তব্য নিয়ে ১৯৭১ সালে Toward A New Public Administration : The Minnowbrook Perspective গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একদিকে যেমন দক্ষতা, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, ব্যয়সংকোচ ইত্যাদি পুরানো বিষয় এই আলোচনা-সভায় আলোচিত হয়, একইসঙ্গে প্রশাসনে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ব্যক্তির সঙ্গে আমলাতন্ত্রের সম্পর্ক ইত্যাদি নতুন বিষয়ও আলোচনায় স্থান পায়।

যে দৃষ্টিকোণ থেকে নব জনপ্রশাসন বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাকে আলোচনা করতে থাকে, তার থেকে বোঝা যায় যে এই প্রজন্মের তাত্ত্বিকদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপন—উভয় বিষয়ের প্রভাব থেকে জনপ্রশাসনকে মুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন বিষয় হিসেবে জনপ্রশাসনকে প্রতিষ্ঠা করা।

(চ) ষষ্ঠ পর্ব : জনপ্রশাসনের স্বতন্ত্র বিকাশ (১৯৭০—) :

তুলনামূলক জনপ্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন এবং নব জনপ্রশাসন যে উদ্যম ও গতি সহকারে গড়ে উঠেছিল তা' পরবর্তীকালে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও বলা প্রয়োজন যে এই বিভিন্ন ধারার আলোচনা জনপ্রশাসনকে একাধারে সমৃদ্ধ করে ও অত্যন্ত প্রভাবশালী আলোচনার ধারা হিসেবে স্থান পেতে সাহায্য করে।

এই পর্বে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংগঠন ও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয় যা জনপ্রশাসনের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে। ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে National Association of Schools of Public Affairs and Administration প্রতিষ্ঠিত হয় (NASPAA)। এই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে জনপ্রশাসন একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে জনপ্রশাসন পড়ানো হতে থাকে।

এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দ্বিতীয় মিনোব্রুক সম্মেলন (১৯৮৮)। অর্থনীতি, পরিকল্পনা, নীতি আলোচনার বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ প্রমুখেরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রশাসনিক নৈতিকতা, সামাজিক সাম্য, মানবসম্পর্ক, জনপ্রশাসন ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক ইত্যাদি এই সম্মেলনে আলোচিত হয় যা সামগ্রিকভাবে জনপ্রশাসনকে সমৃদ্ধ করে।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথা এ প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন যা সামগ্রিকভাবে জনপ্রশাসনকে প্রভাবিত করে। ১৯৮০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, ইতালি, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে New Rights-দের প্রভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সীমিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। একদিকে ব্যবহারিক স্তরে আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা, অপরদিকে জনপছন্দ তাত্ত্বিক ও নয়া-উদারনীতিবাদের প্রভাবে আমলাতন্ত্র তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে আনার প্রয়াস দেখা যায়। ফলে বেসরকারী প্রশাসন, বেসরকারী ব্যবস্থাপন ইত্যাদি গুরুত্ব পেতে থাকে এবং জনপ্রশাসনে নতুন ভাবনাচিন্তার দেখা পাওয়া যায়।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতেও একদিকে আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা ও অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। বিকল্প উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ে। এই প্রসঙ্গে de-administering development-এর ধারণা গুরুত্ব পায় যেখানে সরকারী সংগঠনের সঙ্গে, বেসরকারী সংগঠন এবং বিশেষ করে Non-Governmental Organization

(NGO)-দের সাহায্যে প্রশাসনকে উন্নয়নমুখী করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছে। জনপ্রশাসনের আলোচনাতেও সেই কারণে বিকল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পাচ্ছে এবং এ প্রসঙ্গে Governance সংক্রান্ত ধারণা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমগ্র পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের উল্লেখ করাও প্রয়োজন। পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সেক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কতটা সাফল্য পেতে পারে তা আজ সরাসরিভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন (Globalization and Public Administration) : সাম্প্রতিককালে জনপ্রশাসনের আলোচনায় যে নতুন তত্ত্ব, নতুন চিন্তা ও নতুন দিশার দেখা পাওয়া যাচ্ছে তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে ১৯৮০-র দশকের নতুন অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে। জনপ্রশাসনের সনাতনী চিন্তাগুলো নয়া-উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিক, গোষ্ঠীতাত্ত্বিক ও জনপছন্দের তাত্ত্বিকদের দ্বারা আজ সমালোচিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে আজ জাতীয় অর্থনীতি অনেক বেশী উন্মুক্ত ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত। যেহেতু জাতীয় অর্থনীতি আজ তার স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে এবং বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, স্বভাবতই জনপ্রশাসন, জনব্যবস্থাপনকেও আজ নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে।

সনাতনী জনপ্রশাসন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতার প্রেক্ষিতেই আমলাতন্ত্রকে সমালোচিত করা হচ্ছে তা নয়, কেন শুধুমাত্র আমলাতন্ত্রের হাতেই জনসম্পদ ও জনপরিষেবা থাকবে জনপছন্দের তাত্ত্বিকেরা সেই প্রশ্নও তুলছেন। ক্রমোচ্চ-স্তরবিন্যস্ত, ক্ষমতাকেন্দ্রিক, নিয়ম-নির্ভর আমলাতন্ত্র পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারছে না। সমাজের উন্নয়নের জন্য সরকারী-বেসরকারী বিভাজনকে গুরুত্ব না দেওয়া উচিত বলে মনে করা হচ্ছে। এই দুইয়ের মধ্যে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাজিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ১৯৯২ সালে David Osborne এবং Ted Gaebler[১৪]-এর Reinventing Government : How the Entrepreneural Spirit is Transforming the Public Sector বইটির প্রকাশনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বইটিতে Entrepreneural Government-এর একটি ধারণা তুলে ধরা হয়।